গুরুপ্রণতি

সঙ্ঘগুরু প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী

প্রব্রাজিকা শুচিপ্রাণা

শ্রীসারদা মঠের প্রথম সঙ্ঘগুরুপদে আমরা পেয়েছিলাম শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্যা ও অন্তরঙ্গ সেবিকা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজীকে। তাঁর কথা লিখতে বসে মনে পড়ছে শিবমহিম্নস্তোত্রের একটি শ্লোক :

''মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ।
পুনামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথন বুদ্ধির্ব্যবসিতা॥''

—তোমার গুণবর্ণনরূপ পুণ্যের দ্বারা নিজের এই বাক্যকে পবিত্র করব মনে করেই এই স্তবে আমার বুদ্ধি প্রবৃত্ত হয়েছে। ভারতীপ্রাণামাতাজীর জীবন অনুধ্যানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

দেবীপ্রতিমা পূজিত হওয়ার আগে যেমন থাকে কাঠামো-গঠন, মৃত্তিকা-লেপন, রং-তুলি সহযোগে মূর্তিনির্মাণ, পরে দেবীর বোধন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পূজা ইত্যাদি, ঠিক তেমনই ভারতীপ্রাণামাতাজীর সঙ্ঘগুরু পদে উত্তরণের পূর্বেও আছে এমনই কিছু পটভূমি বা ঘটনা যার উল্লেখ না করলে এই মহাজীবনের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

জগজ্জননীর বৃহৎ সংসারের গুরুদায়িত্ব বহনের জন্য যিনি দৈবনির্দিষ্ট, ক্ষুদ্রসংসারের বেড়াজাল তাঁকে আবদ্ধ করতে পারেনি স্বাভাবিক নিয়মেই। ''জগৎ চায় এমন বিশ জন নরনারী যারা সদর্পে পথে দাঁড়িয়ে বলতে পারে ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সম্বল''—যুগাচার্যের এই অমোঘ আহ্বানের সুরই যেন বেজে উঠেছিল মাতাজীর অন্তরে। তাই একমাত্র ঈশ্বরকেই সম্বল করে অনিশ্চিতের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি নিতান্তই বালিকা বয়সে।

বুদ্ধপূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তাঁর মহামন্ত্র লাভ। এর আগে বা পরে কোনও বিরুদ্ধ পরিবেশই তাঁর মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এ-প্রসঙ্গে পরে মাতাজী বলতেন, ''মনে খুব জোর আসত এক-এক সময়। কেন বেরিয়েছি? এতরকমের ভিতর দিয়ে তো যাওয়া হল! যার জন্য বেরুনো, তা যেন সিদ্ধ হয়—সেই চিন্তাটাই আমায় সবসময় ধরে এগিয়ে নিয়ে যেত।'' বৃন্দাবনে থাকতে রোজ লক্ষ জপ করতেন। স্নান-খাওয়া বাদে সারাদিন শুধু জপ। আবার উদ্বোধনে এর বিপরীত চিত্র। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে থাকার সময় মা, গোলাপ মা ও যোগীন মার সেবাই ছিল সাধনা, সেটিই তপস্যা। হয়তো কোনওদিন গঙ্গাস্নানের সময় একশো আট জপ করে নিলেন, এছাড়া সারাদিনে আলাদা করে জপ করার আর সময় হত না। তাঁর ধীর, নম্র অথচ কর্মতৎপর সেবা শ্রীশ্রীমা খুবই পছন্দ করতেন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন, ''সরলাদির

সেবা দেখবার মতো ছিল—অনলস, কোনও ত্রুটি নেই, যেন তপস্যা।"—এসবই প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্বের প্রয়োজনীয় ক্রিয়াদি।

জগৎ জগতের নিয়মে চলে। একে একে প্রিয়জনেরা চলে গেছেন। সাধনজীবন কিন্তু থেমে থাকেনি। শরৎ মহারাজের একটি চিঠিতে দেখতে পাই তাঁর অমোঘ আশীর্বাদ—''তুমি আনন্দে আছ এবং যাঁহাকে ধরিলে কেবল শান্তি পাওয়া যায় তাঁহাকে ধরিতে পারিয়াছ তোমার পত্রে ওইকথা জানিয়া যোগীন মার ও আমার প্রাণে কত আনন্দ হইয়াছে তাহা বলিবার নহে। যোগীন মা বলিলেন—একমনে একপ্রাণে মার সেবা করিয়াছিল বলিয়াই মার কৃপায় সরলার এই অবস্থা হইয়াছে।... আশীর্বাদ করি মার পাদপদ্মে তার মন দিন দিন ডুবে যাক। আমিও যোগীন মার সহিত ওই আশীর্বাদ করি।"

শরৎ মহারাজ শুধু আশীর্বাদই করেননি, আশীর্বাদের ফলটিও হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন—''তোমার জন্য আমারও বড়ো ভাবনা ছিল, কিন্তু এখন আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। ঠাকুর, মা তোমার ভার নিয়েই ছিলেন, কিন্তু এখন দেখলাম তাঁরা সম্পূর্ণ ভার নিয়েছেন। আমিও একেবারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েছি।... মাকে এতদিন মানবীরূপে পূজা করেছ, এখন তাঁর স্বরূপ জানার চেষ্টা করো।" মহারাজ সরলাকে বিধিমতে কৌলসন্ন্যাসদীক্ষাও দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী সারদানন্দ শ্রীমায়ের নামাঙ্কিত স্ত্রীমঠের ভাবী সঙ্ঘগুরুকে নিজেই যেন চিহ্নিত করে গেলেন।

কাশীতে মাতাজীর ছোট বাড়িটির অনাড়ম্বর পবিত্র মাধুর্যময় পরিবেষ্টনীর মধ্যে যে কেউ গিয়ে পড়ত মুগ্ধ হত, সম্ভ্রম জাগত তার অন্তরে। কাশীর অসহ্য গরমে, প্রচণ্ড শীতেও (একটিমাত্র গরম চাদরই তাঁর ছিল) তিনি সারাদিন জপ করতেন। এক সঙ্গিনী একবার কিছুদিন তাঁর কাছে ছিলেন, সন্ধ্যাবেলা গরমের জন্য তিনি কিছুতেই জপে মন বসাতে পারতেন না। মাতাজী তাঁকে গায়ে একটা ভিজে গামছা জড়িয়ে বসতে বলতেন। কিন্তু কিছুতেই বলতেন না, ''আজ আর জপ না করলে।" বরং বলতেন, ''ছোটোবেলা একরকম করেছিলে। এখন সংসারের ধাক্কাতে কত ময়লা মাটি জমা হয়েছে, একটু বেশি জপ-ধ্যান না করলে গাদগুলো যাবে কী করে?" জপের সংখ্যায় বেশি মন না দিয়ে একমনে নির্দিষ্ট সময়ে জপ করতে বলতেন। বলতেন, ''করে দেখ না, দেখবে আনন্দ পাবে, মন শান্ত হবে, মনের ময়লা কেটে গিয়ে পরিষ্কার হবে।" শ্রীশ্রীমা যেন তাঁর তপের ঐশ্বর্য ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর এই কন্যাটির অন্তরে। আর তাঁর অধ্যাত্মজীবনের বেশিরভাগটাই শ্রীশ্রীমায়ের মতো লোকচক্ষুর অগোচরে ঘটে গিয়েছিল। মাতাজীর দীর্ঘ সাতাশ বছরের নিঃসঙ্গ ও কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ তপস্যার জীবন আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

১৯৫৪-র ২ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৩-এর ৩০ জানুয়ারি—আঠারো বছর ভারতীপ্রাণামাতাজী সঙ্ঘগুরুর পদ অলংকৃত করেছিলেন। ১৯৬০ সাল থেকে তিনি মন্ত্রদীক্ষা, সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য দান করতে শুরু করেন। সেই থেকে দেহরক্ষার (জানুয়ারি ১৯৭৩) তিনমাস পূর্ব পর্যন্ত দীক্ষা দান করে তিনি বহু সন্তানের অধ্যাত্মজীবনের ভার গ্রহণ করেছেন। গুরুর আসনে আসীন তাঁর নিরভিমানিতা, মাধুর্য, সকলের প্রতি নির্বিচার ভালবাসা ছিল দেখার মতো। সে-ভালবাসা প্রকাশ পেত সুমিষ্ট কথনভঙ্গিতে, করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে ও অপার্থিব মধুর হাসিতে। তাঁর চরিত্রে যে-বিশেষ গুণগুলি মঠবাসিনী ও ভক্তদের আকৃষ্ট করত তা হল তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, অপূর্ব নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা, তপস্যা ও কৃচ্ছ্রতার প্রতি অনুরাগ। তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে মঠ-মিশনের কাজের বহু প্রসার ঘটিয়েছিলেন।

অবশ্য মাতাজী মনে করতেন নিজ জীবন গঠন ও সাধনভজনে অধিক মনোযোগী হলেই আরও ভাবপ্রচার সম্ভব। কাজের পরিধি সীমিত রেখে জপধ্যান ও অধ্যাত্মজীবন গঠনের দিকেই গুরুত্ব দিতেন তিনি। সঙ্ঘে নবাগতা ব্রহ্মচারিণীদের অন্তর্জীবন যাতে প্রথম থেকেই জপধ্যানের মাধ্যমে গড়ে ওঠে সেদিকে মাতাজীর সজাগ দৃষ্টি থাকত। বলতেন, ''মন চঞ্চল হোক, বিরক্তি আসুক, যা কিছু বাধা আসুক না কেন, জপ করতে ছাড়বে না।... 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে'। অভ্যাস আর বৈরাগ্যই চঞ্চল মনকে স্থির করতে পারে।... মনের মধ্যে সর্বদা একটা সদ্‌ভাব, সচ্চিন্তা জাগিয়ে রাখবে। কাজগুলি ঠাকুরের কাজ ভেবে অনুরাগের সঙ্গে করতে পারলে তা-ই আমাদের অন্তর্মুখ করে তুলবে। মন শান্ত হবে, শান্তি আসবে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শুধু এই মনে রাখতে হবে যা কিছু করছি সব শ্রীঠাকুরের কাজ।''

দীক্ষিত সন্তান, সমীপাগত ভক্ত, মঠবাসিনী—সকলের ক্ষেত্রেই জপের প্রতি নিষ্ঠার ওপর মাতাজী খুব গুরুত্ব দিতেন। বলতেন, ''মন বসতে চাইবে না, ভালোও লাগবে না। তবু ছাড়তে নেই। জোর করে লেগে থাকতে হয়। মনকে বলতে হবে (জপের সময়)—মন, এইবার তুমি সরে দাঁড়াও। সারাদিন তো নাকে দড়ি দিয়ে আমায় ঘুরিয়েছ। এইবার তুমি সরো। এখন আমি আছি আর আমার ইষ্ট আছেন, আর কেউ কোথাও থাকবে না।''

মাতাজী একবার দক্ষিণ ভারতের এক কেন্দ্রে গেছেন। সন্ধ্যারতির পর তিনি একটু হাঁটতেন। এরকম হাঁটতে বেরিয়ে একদিন এক আশ্রমিককে বলছেন, ''দেখ, আজ আমার মালায় জপ করা হয়নি।'' শুনে তিনি বলেন, ''কেন মা, আপনি তো মনে মনে সর্বদাই শ্রীশ্রীমার সান্নিধ্যে আছেন, তাও কি জপ সম্বন্ধে অত নিয়ম মানতে হবে?'' মাতাজী শুনে খুব জোরের সঙ্গে বললেন, ''হ্যাঁ হ্যাঁ দরকার আছে, নিষ্ঠার প্রয়োজন সকলেরই আছে।''

মাতাজী সঙ্ঘের প্রত্যেককেই, বিশেষ করে নবাগতাদের মনে প্রথম থেকেই এই ভাবটি স্পষ্ট করে দিতেন—''এখানে এলে শুধু ঠাকুরকে নিয়ে পড়ে থাকা। যেখানে যখন থাকবে জানবে—ঠাকুরের জায়গা।'' সঙ্ঘের সকলকে ত্যাগ ও সেবার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর কী আন্তরিক প্রচেষ্টাই না ছিল! বলতেন, ''আমাদের জীবনে ত্যাগ ও প্রেম এই দুটিকে কার্যকরী করতে পারলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তোমরা যে-উদ্দেশ্যে এসেছ তা সফল হোক—এই প্রার্থনা করি। ঠাকুর শুধু ছবি নন, এই মঠের সর্বত্র জীবন্ত—সাক্ষাৎভাবে আছেন।... গোলাপ মা আমাদের বলতেন, 'মনে রাখবে আমি এসেছি নিজের উন্নতির জন্য, অপরকে শেখানোর জন্য নয়।' এই কথা স্মরণ রাখলে মনে আর দ্বন্দ্ব থাকে না, ত্যাগ কেবল বাইরে করলে হবে না। সেরকম ত্যাগ করা

কঠিন নয়—ত্যাগ করতে হবে অন্তর থেকে।"

মাতাজী আরও বলতেন, ''বড় বড় কথা বলে কী হবে? জীবন দেখাও।"

সেবার প্রতিমূর্তি ছিলেন মাতাজী। শুধু ঠাকুর-সেবাই নয়, সকলের প্রতিই তাঁর সেবার মনোভাব ছিল। একবার ত্রিচুর আশ্রমে এসে শোনেন তাঁর দীক্ষিত এক বৃদ্ধ দম্পতির একজন ব্লাডপ্রেসারে ভুগছেন, অপরজনের হার্টের অসুখ। তাঁরা আশ্রমে এসে গুরুপ্রণাম করতে পারবেন না। শুনেই মাতাজী আগ্রহ প্রকাশ করেন তাঁদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য। বলেন, ''কে জানে এ-জীবনে আর ওদের সঙ্গে দেখা হবে কি না।" পরদিন মাতাজী তাঁদের বাড়িতে যান। অভাবিতরূপে বাড়িতে শ্রীগুরুর চরণধূলি পড়ায় ভক্তদম্পতি আনন্দে দিশেহারা। পরের বার মাতাজী কেরল যাওয়ার আগেই তাঁদের দেহান্ত হয়।

নানা দোষত্রুটি সত্ত্বেও সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণী সকলকে মাতাজী ভালবাসা দিয়ে সঙ্ঘে ধরে রাখতে চাইতেন। ঠাকুর-মায়ের নামে যারা বেরিয়েছে সকলেই যাতে ত্যাগের জীবনে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সঙ্ঘে আনন্দে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারে এবং পরমানন্দলাভের সন্ধানে মনপ্রাণ অর্পণ করতে পারে সে-বিষয়ে মাতাজী ছিলেন সদাসতর্ক ও যত্নশীল।

আধ্যাত্মিক জীবনাচরণ ও উপাসনাদির ক্ষেত্রে মাতাজী খুঁটিনাটি বাছবিচারগুলি এড়িয়ে চলতেন। বরং প্রাধান্য দিতেন চিরাচরিত পূজাপদ্ধতি অপেক্ষা ব্যাকুলতা ও আত্মনিবেদনকেই। এক সন্ন্যাসিনী সন্ধ্যারতির পর মাঝে মাঝে ঠাকুরের সামনে গান করতেন। গান করতে গিয়ে জপধ্যান কম হচ্ছে ভেবে দু-একটি গান করেই উঠে পড়তেন। মাতাজী সেইসময় ঠাকুরঘরে বসে জপ করতেন। একদিন মাতাজী তাঁকে বললেন, ''কী দু-একটা গান করে উঠে পড়ো, ওটা কি জপধ্যানের চেয়ে কম? যেদিন গান করবে সেদিন সেটাই ভাল করে করবে; অনন্তপক্ষে তিন-চার খানা।" মাতাজীর কথা শুনে তিনি ভজনের যথার্থ গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করলেন।

শ্রীশ্রীমা ভারতীপ্রাণামাতাজীকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন, ''ইনিই তোমার সর্বস্ব, এঁকে ডেকো, তাহলেই তোমার সব হবে।" সঙ্ঘগুরুরূপে মাতাজী ভক্তদেরও অনুরূপ শিক্ষাই দিতেন। জপধ্যানে জোর দিতে বলতেন শ্রীশ্রীমাকে উদ্ধৃত করে, ''যার আছে সে মাপো, যার নেই সে জপো।" আবার বলতেন—''ভ্রমিয়ে বারো, ঘরে বসে তেরো, যদি করতে পার।" অর্থাৎ ভ্রমণ করলে যে-ফল পাবে, এক জায়গায় বসে মন লাগিয়ে ধ্যানজপ করলে তার চেয়ে বেশি ফল পাবে। সম্পূর্ণ শরণাগতি ও নির্ভরতাই ছিল তাঁর অধ্যাত্মজীবনের মূলধন। ঠাকুরের ওপর একান্ত নির্ভরতার শক্তিতেই তিনি জীবনের বহু সুকঠিন পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই আশ্রমবাসিনী বা সংসারী সকলকেই এই নির্ভরতা নামক পরম আশ্রয়ের সন্ধান দিতে পারতেন। এক সন্তানকে পত্রের উত্তরে মাতাজী লেখেন, ''তিনি (শ্রীশ্রীঠাকুর) ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই চাইতেন না এবং অনেককেই সেই ভালোবাসার দ্বারা টানছেন। তাঁকে ডাকতে ডাকতে তাঁর প্রতি ভালোবাসা হলে তবেই শরণাগতির ভাব আসে। মনে যে অঙ্কট-বঙ্কট ওঠে, তাঁকে ডাকতে ডাকতে তা সব চলে যায়।" মাতাজী নিজে শরণাগতির বলেই কাশীর দীর্ঘ নির্বিঘ্ন শান্ত তপোময় জীবন ত্যাগ করে নীরবে ও নির্বিবাদে সঙ্ঘগুরুর আদেশ শিরোধার্য করে শ্রীসারদা মঠের গুরুদায়িত্ব স্কন্ধে তুলে নিতে পেরেছিলেন। মঠে তাঁর কাশীর কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবনের কোনও ব্যতিক্রম তো দেখা যায়ইনি, বরং মঠের জীবনধারা ও তাঁর কর্তব্যবোধ—সমভাবে দুটিকে মিলিয়ে সকলের সঙ্গে সহজ সাবলীলভাবে চলেছেন।

তাঁর ঈশ্বরমুখী জীবনের প্রতিটি ধাপই আধ্যাত্মিক

অগ্রগতির পথ। কোনও ঘটনা বা কাজ সে-পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। সম আগ্রহে ও আনন্দে প্রতিটি কাজকে সমান মূল্য দিতেন। তাই তাঁর দৈনন্দিন জীবনে জাগতিক ও পারমার্থিক ভেদরেখা কোনও সময়েই দেখা যেত না।

খুব নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন মাতাজী। ঠাকুরসেবায় এতটুকু শৈথিল্য তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ঠাকুরসেবার কাজে নিরত সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীদের হাতেকলমে সেবাকাজটি নিখুঁতভাবে দেখিয়ে দিতেন। নিজের হাতে ফল কেটে নৈবেদ্য সাজাতেন। ফল ছোট টুকরো করে কাটতে বলতেন যাতে ঠাকুরের খেতে সুবিধে হয়। ধুনো দেওয়ার সময় ধোঁয়া যেন ঠাকুরের মুখে না লাগে, টেবিল ল্যাম্পের তীব্র আলোয় যেন ঠাকুরের কষ্ট না হয়, ঠাকুরঘরে যেন কোনওরকম শব্দ না করা হয়—ইত্যাদি সবই নিয়ন্ত্রিত হত মাতাজীর সতর্ক তত্ত্বাবধানে। বলতেন, ''তোমরা ভাবছ ঠাকুরঘরে তাঁরা কেবল ছবি? তাঁরা সাক্ষাৎ রয়েছেন। তাঁরাই মঠ চালাচ্ছেন।'' তাই গরম-শীত বুঝে জানালা খোলা বা বন্ধ করা, শীত অনুযায়ী গায়ে পাতলা বা গরম চাদর দেওয়া—সবই একটা ভাব নিয়ে করতে বলতেন। অসাবধানতাবশত বাসনপত্র বা দরজা জানালার শব্দ হলে অসন্তুষ্ট হতেন। ধীর, স্থির, শান্ত ও সতর্ক হয়ে কাজ করতে শেখাতেন। আশ্রমের কাজের ব্যাপারে বলতেন, ''এখানে সব ঠাকুরের কাজ। খুব ভালবেসে মন দিয়ে করবে। ঠাকুর বেড়াবেন, হাঁটবেন, চারিদিকে ধুলোবালি পড়ে থাকলে তাঁর পায়ে লাগবে—এই মনে করে পরিষ্কার করবে।''

যেকোনও কাজে ভাবটিই যে আসল তা মাতাজী শেখাতে চাইতেন। একবার এক দীক্ষার্থীর আনা ফুল নষ্ট হয়ে গেছে দেখে দীক্ষার কাজের ভারপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারিণী বাগানের টাটকা ফুল তাঁর থালায় সাজিয়ে দেন। পরে মাতাজী জানতে চান, ''ওঁর আনা ফুল দাওনি কেন?'' তিনি জানান, ''বাজার থেকে আনা চটকানো ফুল দিতে ইচ্ছা করল না। টাটকা ফুল বেশি থাকাতে ওই ফুল ফেলে দিয়েছি।'' শুনেই মাতাজী তিরস্কারের সুরে বলেন, ''সে কী! ওই ফুল ফেলে দিলে? এখানে আনবে, ঠাকুরকে দেবে এই ভেবেই না সে কিনেছে। এখন দিতে গিয়ে থালায় সেই ফুল মনে মনে খুঁজেছে আর পায়নি। যেমন ফুলই হোক না কেন, ভাবটাই তো বড়।''

একবার মাতাজী মাদ্রাজ কেন্দ্রে থাকাকালীন এক ভক্ত মুরুক্কু এনেছেন। মুচমুচে ভাজা মাতাজী খুশিমনে খেয়েছেন। পরের দিন আর একজন ওই একই ভাজা এনেছেন কিন্তু সেটি বেশ শক্ত। তাই সেবিকারা মাতাজীর খেতে কষ্ট হবে ভেবে আগের দিনের ভাজাটাই দিলেন। তিনি জানতে চাইলেন এ- ভাজা কার আনা। যখন জানতে পারলেন সেদিনের ভাজাটা শক্ত বলে তাঁকে দেওয়া হয়নি, তখন সেই শক্ত ভাজাটাই চেয়ে খেলেন। বললেন, ''দেখো, এরা তো আমি কিছু খাব এই আশা করেই এনেছে, তাই একটু একটু মুখে দিই।'' সেবিকারা বুঝতে পারলেন মাতাজীর খাওয়া রসনাতৃপ্তির জন্য নয়, ভক্তদের ভাব গ্রহণ করেই তিনি সন্তুষ্ট।

মাতাজীর কোনও কথায় বা কাজে কর্তৃত্বের ভাব কখনও প্রকাশ পেত না। তাঁর সব আচরণে প্রকাশ পেত যে, ঠাকুর-মা-ই সব করছেন এবং তিনি তাঁদের হাতের যন্ত্রমাত্র। তাঁর কাছে গেলে ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিগ্ধ মনেরও সব সংশয় দূর হয়ে যেত। একদিন মাতাজীর এক শিষ্যা হতাশভাবে জানতে চান, ''শ্রীশ্রীমা কি আর আমাকে কৃপা করবেন?'' শুনেই মাতাজী দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, ''তোমার কী? সদ্‌গুরু পেয়েছ, সদাশ্রয় পেয়েছ।'' আর একবার দীক্ষা নেওয়ার জন্য কেউ ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন সারদা মঠে সদ্‌গুরু আছেন কি না! মাতাজী বিন্দুমাত্র দ্বিধা

না করে বলেন, ''বলে দাও—আছেন।'' এই ঘটনাগুলি থেকে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি মাতাজী সাধারণ গুরু ছিলেন না। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, তাঁর অপরিমেয় আধ্যাত্মিক সম্পদের যথার্থ অধিকারিণী।

গুরুভাবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বহু তাপদগ্ধ নরনারী তাঁর পূত সান্নিধ্যে খুঁজে পেয়েছেন প্রকৃত শান্তি ও আনন্দের সন্ধান। একবার সেনাবাহিনীর এক কর্মী রণক্ষেত্র থেকে দুদিনের জন্য এসে মার কাছে দীক্ষা নিয়ে যান। দীক্ষার পর তিনি মাকে জানান, ''আমি কী করে জপ করব জানি না। যুদ্ধ সারাক্ষণ লেগেই আছে, গোলাগুলি পড়ছে চারদিক থেকে।'' মা শুনে বললেন, ''তাহলে trench-এর ভেতরেই জপ করবে। তোমার সঙ্গীরা যখন দেখবে যে সকাল-সন্ধে তুমি একটু সময় শান্ত হয়ে বসে প্রার্থনা করছ, তারা সে-সময়ে আর তোমাকে বিরক্ত করবে না।'' একবার ভিন্ন আশ্রমে দীক্ষিত এক ভক্তমহিলা মাতাজীকে জানান, ''সবই রয়েছে কিন্তু শান্তি পাচ্ছি না। শান্তি কীসে পাব মা, বলে দিন।'' মাতাজী তাঁকে বলেন, ''যে নাম পেয়েছ মা, তাই নিষ্ঠাভরে জপ করে যাও, তাতেই শান্তি পাবে। ঠাকুর-মা সকলেই তো বলে গেছেন সংসারে সব কাজ করে যাবে কিন্তু মনটা ভগবানের পায়ে ফেলে রাখবে। চেষ্টা করে যাও, দেখবে আর কষ্ট পাবে না। নাম করে যাও। একমাত্র এতেই শান্তি পাবে তুমি।''

মাতাজী ঠিক মায়ের মতোই দীক্ষিত সন্তানদের সব ভার নিতেন। তাঁর এক শিষ্যার স্মৃতি : ''মা (মাতাজী) আমাকে যখন যা বলেছেন, ছোটখাট বিষয় থেকে বড় ব্যাপার পর্যন্ত সবই সত্যে পরিণত হতে দেখেছি। একবার আমার একটা অস্ত্রোপচার করবার কথা হয়েছিল। মা বলেন—'না তোমার ওটা অস্ত্রোপচার করতে হবে না, আপনিই সেরে যাবে।' বাস্তবিক তা-ই হয়েছিল।'' একবার মাতাজীর এক শিষ্যা মঠে এসে তাঁকে বলেন, ''মা আমাদের পরিবারে নানাদিক দিয়ে বড়ই খারাপ যাচ্ছে, তাই একজন আমাকে তাবিজ ধারণ করবার কথা বলেছেন, করব কি?'' মা তাঁকে সাহস দিয়ে বললেন, ''না, শুধু জপ বাড়িয়ে দাও, খুব করে জপ করো।''

মানুষের প্রতি বিশেষত অসহায়, অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষের প্রতি মাতাজীর ছিল অসীম ভালবাসা ও সহানুভূতি। প্রতিবেশী মহিলাদের সাংসারিক নানা দুঃখকষ্টের কথা মন দিয়ে শুনতেন এবং যথাযথ পরামর্শ দিয়ে তাঁদের মনে আনন্দের সঞ্চার করতেন বা প্রয়োজনমতো ব্যবস্থাদি করতেন।

জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল—''সকলের মঙ্গল হোক, সকলের অবিদ্যা দূর হোক। ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'' ইত্যাদি।

তিনি আজ স্থূল শরীরে আমাদের মধ্যে নেই সত্য কিন্তু তাঁর গুরুশক্তি সঙ্ঘকে রক্ষা করে চলেছে। তিনি জগজ্জননী শ্রীশ্রীমারই প্রতিরূপ বা প্রতিনিধি, তাঁরই সচল বিগ্রহ। সেই মহাশক্তিই গুরুশক্তিরূপে তাঁর মধ্য দিয়ে কাজ করে গিয়েছে, এখনও অলক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। সেই অমোঘ শক্তির ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই। গুরু মর্ত্যশরীর ত্যাগ করলেও তাঁর শক্তি সদাজাগ্রত। স্মরণ করি ভারতীপ্রাণামাতাজীর মুখনিঃসৃত এক অমোঘ বাণী—''শ্রীশ্রীমা যা বলতেন তাই স্মরণ করিয়ে দিই—'তোমরা সবসময় জেনো তোমাদের একজন মা আছেন'—এই বিশ্বাস রাখতে হবে। তাঁরই আশীর্বাদে এই সঙ্ঘ, তাঁর শক্তিতে এর শক্তি। তিনি সর্বদা আমাদের পালন ও রক্ষা করছেন।'' শ্রীসারদা-ভাবানুরঞ্জিতা, প্রথম সঙ্ঘগুরু প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজীর উদ্দেশে জানাই আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণতি।